শ্রাবণে কবিতার মূল ভাব :

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যসাহিত্যে যাঁরা নারী সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের নানা বিধিনিষেধ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি তাঁর কবিমানসকে বিকশিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক হলেও তাঁর কবিতায় বাংলার গ্রামীণ দৃশ্য এবং অন্তঃপুরের নারীদের সুখ–দুঃখ এক মায়াবী ও সরল ভাষায় ফুটে উঠেছিল, যা বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য গভীর মমতায় ধরা পড়েছে, তেমনি অন্যদিকে মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতি, প্রেম, বিরহ, স্বপ্ন, স্মৃতি, নিঃসঙ্গতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনা শিল্পিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

'শ্রাবণে' কবিতাটিতে শ্রাবণ মাসের প্রকৃতি কেবল একটি ঋতুচিত্র হিসেবে লেখিকা দেখাননি বরং মানবমনের গভীর আবেগ, স্বপ্ন, প্রেম, নিঃসঙ্গতা এবং রহস্যময় অভিজ্ঞতার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকৃতি এখানে নিছক পটভূমি নয়, মানুষের অন্তর্জগতেরই এক অনুরণন। শ্রাবণের মেঘ, পূর্ণিমার আলো, নিস্তব্ধ রাত, ঘুমে আচ্ছন্ন পরিবেশ–সব মিলিয়ে এমন এক আবহ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে বাস্তব ও কল্পনা, জাগরণ ও স্বপ্ন, দৃশ্য ও অদৃশ্য পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়।

বাংলা সাহিত্যে শ্রাবণ মাস অর্থাৎ বর্ষাকাল বরাবরই প্রেম, বিরহ, স্মৃতি এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বৈষ্ণব পদাবলি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ-সকলের সাহিত্যেই শ্রাবণ এক বিশেষ আবেগ বহন করে। গিরিন্দ্রমোহিনী সেই ঐতিহ্যকে নিজের স্বতন্ত্র কাব্যভাষায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর কাছে শ্রাবণ শুধু বর্ষার মাস নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের নিভৃত অনুভূতির ঋতু।

কবিতার শুরুতেই কবি এক নিঃসঙ্গ পরিবেশ নির্মাণ করেন–'বিজন গৃহে একা'। এই একটি কথাতেই কবিতার আবহ নির্মিত হয়েছে। চারদিকে প্রকৃতির বিপুল বিস্তার থাকলেও কবির অবস্থান এক নির্জন কক্ষে। বাইরে শ্রাবণের মেঘ, ভোরের আলো, পূর্ণিমার আকাশ, আর কবির ভিতরে নিঃসঙ্গ এক মন। এই দ্বৈত পরিবেশই কবিতার প্রধান শিল্পরীতি। বাহ্যিক প্রকৃতি যেমন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, তেমনি কবির অন্তরও অনুভূতির নানা স্তর অতিক্রম করে।

'শ্রাবণে' কবিতায় প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। প্রকৃতি যেন মানুষের মনেরই প্রতিচ্ছবি। মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি স্মৃতি ও অনুভূতি মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে। আবার পূর্ণিমার আলো যেমন মেঘের আড়াল থেকে ক্ষণিকের জন্য উঁকি দেয়, তেমনি মানুষের জীবনে আনন্দ ও আশার ঝলকও ক্ষণস্থায়ী। এই প্রতীকী ভাবনাই কবিতাটিকে সাধারণ প্রকৃতিবর্ণনার সীমা অতিক্রম করে দার্শনিক তাৎপর্য প্রদান করেছে। কবিতায় কবি প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনার বর্ণনা দেননি। বরং তিনি একটি অনুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। সেই পরিবেশে পাঠক নিজেও যেন

কবির সঙ্গে এক নির্জন কক্ষে উপস্থিত হন, শ্রাবণের রাতের নীরবতা অনুভব করেন এবং এক রহস্যময় উপস্থিতির স্পর্শ উপলব্ধি করেন।

নিঃসঙ্গ মানবমনের অন্তর্লোক, স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখা, প্রেমের অদৃশ্য উপস্থিতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার গভীর মিলন যেন কবিতায় স্পষ্ট হয়েছে। কবি শ্রাবণের নিস্তব্ধ রাত্রিকে আশ্রয় করে এমন এক মানসিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। কবির এই একাকীত্ব কেবল শারীরিক নয়, এটি মানসিক নিঃসঙ্গতারও প্রতীক। মানুষের জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন চারদিকে মানুষ থাকলেও অন্তরে গভীর শূন্যতা বিরাজ করে। কবি সেই অন্তর্নিহিত নিঃসঙ্গতার চিত্র এঁকেছেন।

প্রকৃতির বর্ণনায় কবি এনেছেন- মেঘ, ভোর, পূর্ণিমা, ঘননীল আকাশ। প্রকৃতির এই পরিবর্তনশীল রূপ মানুষের মনের পরিবর্তনেরই প্রতিচ্ছবি। শ্রাবণের আকাশে যেমন কখনও মেঘ, কখনও চাঁদের আলো দেখা যায়, তেমনি মানুষের মনেও কখনও বিষাদ, কখনও আনন্দ, কখনও আশা, কখনও স্মৃতি ভেসে ওঠে। কবি প্রকৃতির এই চিরন্তন পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের আবেগের রূপ খুঁজে পেয়েছেন। পূর্ণিমার চাঁদ এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ণিমা সাধারণত পূর্ণতা, প্রেম, সৌন্দর্য এবং শান্তির প্রতীক। কিন্তু কবিতায় সেই পূর্ণিমাও মেঘে ঢাকা। অর্থাৎ জীবনের পূর্ণতা সবসময় স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। আসলে লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনে স্বামীর অকাল মৃত্যু ও তার ফলে কবির নিঃসঙ্গ জীবনের ছবি যেন কবিতার প্রতিটি ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। তবে মাঝেমধ্যে মেঘ সরে গেলে যেমন চাঁদের আলো দেখা যায়, কিন্তু লেখিকার জীবনে সেই রকম আশার আলো দেখা যায় না। কারণ সে আজ স্বামীহীনা, সংসারে তার উপস্থিতির কোন মূল্য নেই। তাই শ্রাবণের এই ঘন বর্ষা ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লেখিকার কাছে যেন বিরহ এর কারণ হয়েছে। তাই কবি লিখেছেন–

“বিমুক্ত বাতায়ন-সম্মুখে শেজখানি, কোমল আলো মুখে বুলায়ে যায় পাণি।”

এখানে আলো যেন জীবন্ত সত্তায় পরিণত হয়েছে। আলো মানুষের মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতিকে মানবীয় গুণে অলংকৃত করার মাধ্যমে কবি প্রকৃতি ও মানুষের আত্মিক ঐক্য প্রকাশ করেছেন। আলো এখানে কেবল আলোকরশ্মি নয়, বরং এটি শান্তি, স্নেহ, প্রেম এবং ঈশ্বরীয় আশীর্বাদের প্রতীক।

কবি বলেন— “মানস-গৃহে মম শুধু সে আমি একা।” এই পংক্তির মধ্যে কবিতার অন্যতম গভীর দর্শন নিহিত। স্বামীহীনা না হয়ে লেখিকার যে একাকীত্ব তার যেন এক জীবন্ত আস্ফালন এই কবিতা। মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজের অন্তর্জগতে একাই বাস করে। বাইরের পৃথিবী যতই ব্যস্ত হোক না কেন, আত্মার গভীরে প্রত্যেক মানুষ একা। সেই একাকীত্বেই মানুষ নিজের সঙ্গে কথা বলে, নিজের অনুভূতিকে চিনতে শেখে এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে। এই সময় কবি যেন তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং এক অদৃশ্য উপস্থিতি যেন তাঁকে গ্রাস

করেছে। সেই অদৃশ্য উপস্থিতি চলে গেলেও তার প্রভাব হৃদয়ে রয়ে গেছে। এই অনুভূতিই লেখিকার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য।

কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী স্বপ্ন, প্রকৃতি ও অন্তর্জাগতিক অনুভূতির সমন্বয়ে এমন এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন আলোচ্য কবিতায় যা বাস্তবের সীমা অতিক্রম করে হৃদয়ের গভীরে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে। তাই কবিতাটি প্রেমের কবিতা নয়,এটি মানবমনের অনুভূতি, বিরহ এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক অনন্য কাব্যরূপ।